প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক চেতনা, নব্য-উপনিবেশবাদ, এবং উপনিবেশোত্তর চেতনা

'উপনিবেশ' শব্দটি কেবলমাত্র কোনো দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা দখলের লড়াইকে বোঝায় না। বৃহত্তর ভাবে 'উপনিবেশবাদ' পার্থিব সম্পদের সঙ্গে-সঙ্গে মননের সম্পদকেও লুণ্ঠন করে দীর্ঘকাল ধরে দেশের সাংস্কৃতিক আবহকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে ঔপনিবেশিক সমাজে শাসকের স্বার্থ-প্রণোদিত এক বিশিষ্ট চিন্তা ও জীবনভঙ্গি জন্মলাভ করে।

মুঘলযুগে ভারতে বাণিজ্যপুঁজির কিছু বিকাশ ঘটলেও শিল্পপুঁজি গড়ে ওঠেনি। তবে প্রাক্ বৃটিশ ভারতে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। বহির্বিশ্বের সঙ্গে গ্রামগুলির সামান্য বিনিময় ঘটত। গ্রামের আর্থিক জীবন আদিম কৃষি ও কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল। নীচুমানের শ্রমসাধ্য উৎপাদন পদ্ধতির ফলে শ্রমজাত ফললাভ হত অত্যন্ত কম। জীবনধারণের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন এবং অর্থলোলুপ শাসকের দাবি মেটানোর পর উদ্বৃত্ত কিছুই থাকত না। অনিশ্চিত জীবনযাত্রা, পরিবর্তনহীন মূল্যবোধ, ব্যবহারিক কুসংস্কার, ধর্মীয় প্রভুত্ববাদ, পর্যায়বদ্ধ জাত-ব্যবস্থা এবং কঠোর সামাজিক অনুশাসন নিয়ে যে সমাজ ছিল, সেই সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যম, দুঃসাহসিক কাজ বা নতুন উপায় অন্বেষণের পক্ষে সহায়ক পরিবেশ ছিল না। ধর্মের অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যায় গ্রামীণ চৈতন্য আচ্ছন্ন করে রাখা হত। ফলে জাত-ব্যবস্থার নির্মম কাঠামো, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কোনো সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ সংঘবদ্ধ হত না। প্রবল ধর্মীয়চাপ এবং জমিভিত্তিক প্রভুত্বপরায়ণ যৌথপরিবার-কাঠামো মানুষের বিদ্রোহী সত্তাটিকে বিকশিত হতে দিত না।

এই সময় পৃথিবীর সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ ইংল্যান্ডের সংস্পর্শে এল ভারত। ভারতের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের শোষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল কাঁচামাল। ঔপনিবেশিক শোষণের আদিপর্বে কৃষক নিপীড়ন, বণিক ও ব্যবসায়ীদের নানা ভাবে বঞ্চিত করা, তাঁত ও অন্যান্য কুটির শিল্পের ধ্বংস ইত্যাদির দ্বারা মধ্যযুগীয় গ্রামীণ কাঠামোর ধারাবাহিকতাকে নস্যাৎ করে ভারতকে কেবলমাত্র একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করল ইংল্যান্ড। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামের ব্যবস্থাটির দ্বারা বৃটিশশক্তি বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনল। ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই ভূমি-ব্যবস্থার সাহায্যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসন-শোষণের মূল ভিত্তি স্থাপিত করল।

উপনিবেশবাদ বাংলার সমাজকে যে নতুন সাম্রাজ্যবাদী রূপ দিল, তা পুরাতন সমাজের গঠন শৃঙ্খলার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নতুন সমাজে বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী শ্রেণির উদ্ভব হল। তবে বৃটিশ পুঁজি বিনিয়োগের একাধিপত্যের ফলে, বুর্জোয়া শ্রেণির খুব স্বাভাবিক

বিকাশ ঘটল না। মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হল না। কৃষক সমস্যা তীব্রতর হল। আগে শ্রেণি বিচারের মানদন্ড ছিল বংশমর্যাদা, কিন্তু বৃটিশ আমলে যে নতুন জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হল, সরকারের নির্দিষ্ট খাজনা নির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করা ছাড়া তাদের আর কোনো সামাজিক মর্যাদা বা ভূমিকা রইল না। নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা দিতে না পারলে, জমিদারগণ বাস্তুচ্যুত হতেন। তাই তাঁদের চেতনায় গ্রাম, গ্রামের মানুষ, তাদের দুঃখ বেদনার বিষয়ে কোনো অনুভব ছিল না। যেন-তেন প্রকারে অধিক খাজনা আদায় ছিল তাদের লক্ষ্য। এই অত্যাচারী, উদাসীন, মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারে বাংলার গ্রাম ভরে গিয়েছিল।

ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে এদেশে একটা ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। এই শাসন ব্যবস্থার সূত্র ধরেই এদেশে একটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত শিক্ষাব্যবস্থা তারা গড়ে তুলল। প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শিক্ষাবিস্তারে খুব একটা উৎসাহী ছিলনা। ভারতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষা পাঠশালা, টোল, মক্তব ও মাদ্রাসায় পরিচালিত হত। কিছু নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষা ছিল প্রচলিত পাঠ্যসূচি।

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হলে ভারতীয়দের মধ্যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কায় বৃটিশরা সমাজের ধারাবাহিকতাকে ধ্বংস করলেও অনেকদিন পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে বিপুল সংখ্যক কর্মচারি প্রয়োজন ছিল তাদের ইংরাজির জ্ঞান আবশ্যক হয়ে পড়ল। তাই ইংরাজি শিক্ষার দাবিকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা গেলনা। খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তা সত্ত্বেও ভারতে সরকারি শিক্ষা বিস্তারের চিত্রটি ছিল নৈরাশ্যজনক। রামমোহন রায় এইসময় সংস্কৃত শিক্ষার অসারতা প্রমাণ করে, ভারতে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে তদানীন্তন গভর্নর লর্ড আমহর্স্টকে একটি পত্র দেন।[১] এই পত্রটি ভারতীয় শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে এক মূল্যবান দলিল।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের রাজত্বকালে [২] সরকারি শিক্ষা-নীতিতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ লর্ড বেন্টিঙ্ক ইংরাজি শিক্ষাকে সরকারি নীতি রূপে ঘোষণা করেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর ইংরাজি শিক্ষা প্রসারে সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা ছিল অপ্রতুল, উদ্যম ছিল অসম, অর্থবরাদ্দ ছিল যৎসামান্য। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন, সরকারি চাকরিতে ইংরাজি ভাষার জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই ঘোষণার ফলে দেশীয় শিক্ষার সমাধি রচিত হল। গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার পাঠশালা ও মক্তব বন্ধ হয়ে গেল। গড়ে উঠল সহজে ইংরাজি শব্দ শিখে 'হৌসে' চাকরি করার উপযুক্ত হবার বিদ্যালয়। তাদের বিজ্ঞাপনে থাকত 'পাঁচশ' বা 'হাজার' শব্দ শিখিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য একটা হাস্যকর পরিণতিতে পৌছাল। শিক্ষা কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হয়ে উঠল। বেন্টিঙ্ক দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। উইলিয়াম অ্যাডাম এই কমিটির পক্ষ থেকে তাকে যে রিপোর্ট দেন, তার মধ্যে স্পষ্ট ভাবে তিনি

দেশীয় শিক্ষার শোচনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রস্তাব করেন। বলা বাহুল্য তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।

কারণ ইংরাজি শিক্ষা পদ্ধতি যেমন ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখার মতো একদল কর্মচারি তৈরি করল, তেমনই আর একটি জটিল, গভীর ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধি ঘটাল। লর্ড মেকলে বৃটিশ উপনিবেশবাদের মূল লক্ষ্য হিসাবে জানিয়েছিলেন–ইউরোপীয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তির উদ্দেশ্য আসলে 'মগজ ধোলাই'। রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে সংলগ্ন অথচ বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের থেকে দূরে থাকা এমন এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বৃটিশরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যাদের চিন্তা, মনোভাব, রুচি, নীতিবোধ ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার শক্তি দ্বারা এমন ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে যে, প্রাতিষ্ঠানিকতার আশ্রয় ছাড়া তাদের কোন অস্তিত্ব থাকবেনা। এই বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণিগত সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে শাসকের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের উপর। শাসকদের ভাবাদর্শগত কাঠামোকে মহিমান্বিত করা ও শাসিতের কাছে গ্রহণযোগ্য করে প্রচার করাই হবে এদের প্রধান কাজ।

এই নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব উনিশ শতকের যুগান্তকারী ঘটনা। গতিশীল মুদ্রা এদের শ্রেণিমর্যাদা, পদমর্যাদা, সফলতা, বিফলতা এমনকি মনুষ্যত্ববোধের ও নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠল। এদের মধ্যে দেখা গেল বুদ্ধি ও শিক্ষার দম্ভ। এই সময় যে বিপুল পালাবদলের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠল, তাকে সাধারণভাবে আধুনিক যুগের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। দীর্ঘস্থায়ী সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার, দেবকেন্দ্রিক জীবনভাবনার পরিবর্তে মানবকেন্দ্রিক আধুনিক জীবনভাবনা নিয়ে এল 'নবজাগরণ'। কিছু মানুষ বৃটিশ উপনিবেশবাদের প্রতি নির্ভরতা দেখাতে গিয়ে প্রতীচ্য-সর্বস্ব হয়ে উঠলেন। তারা এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কায়েম রাখার ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহৃত হতে দিলেন। ক্রমশ দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, ইউরোপ কেন্দ্রিক মানসিকতায় আশ্রয় নিলেন। এই বিচ্ছিন্নতা, এই পরগাছাবৃত্তির ভাবাদর্শগত কাঠামোটি আধুনিকতার ধারক বলে চিহ্নিত ও গৃহীত হতে থাকল।

নতুন শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রথম সংস্পর্শ ছিল উত্তেজক। আবহমানকালের গ্রামনির্ভর অলঙ্ঘনীয় নিষেধাজ্ঞার থেকে মুক্তিকে মানুষ সহসা স্বাধীনতা বলে ভুল করেছিল। পুরাতন সামাজিক পরিবেশের বিরুদ্ধে অনেকের ক্ষোভ ছিল। এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা বাঙালিকে এক স্থবির, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক অস্তিত্ব থেকে প্রগতিশীল স্বাধীন জীবনে নিয়ে যাবে বলে ভুল করলেন অনেকেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান, কুসংস্কার বিরোধিতা যে সকল ইতিবাচক প্রবণতা বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে সমাজে বিকাশ লাভ করল, তারও পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। সমাজে সামান্য কিছু মানুষের শিক্ষিত হওয়াকে 'নবজাগরণ' হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাই যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন– *"শহরবাসী একদল মানুষ, এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এনলাইটেনড় আলোকিত। সেই আলোর পিছনে গোটা দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যারা ইংরাজি পড়া মুখস্থ করলেন, শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তারা*

দেশ বলতে বুঝলো শিক্ষিত সমাজ।"[৩]

উনিশশতকের নতুন গড়ে ওঠা আধুনিকতায় প্রকৃত আত্মিক মুক্তির সম্ভাবনা ছিলনা। কারণ এই পর্বের সমাজ চিন্তা ধর্মভাবনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রামভিত্তিক গোষ্ঠীভাবনার মতাদর্শকে তখনও পরিবর্তন করতে পারেনি। ফলে কোনো রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠলনা। ঐক্যের ধারণা ধর্মীয় অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ ভারত, হিন্দু ধর্মের বন্ধনে একতাবদ্ধ জনসমষ্টির বাসভূমি, এটাই ছিল বিশ্বাস। ভারত আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে একত্রিত ভারতীয়দের বাসভূমি, এই ভাবনা, এই মনোভাব গড়ে ওঠেনি। ফলে এক হিন্দু ভারত, এক ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের কল্পনায় বুদ্ধিজীবীরা মুগ্ধ হয়ে থাকলেন। অথচ কোনো যথার্থ মানবকেন্দ্রিক জীবনবোধ ছাড়া কোন সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনা। এখানেই উনিশশতকের চিন্তানায়কদের চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতা প্রমাণিত হল। ধর্মীয় ভাবনার কূপমন্ডুকতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন যে কতখানি, সে বিষয়ে তারা সচেতন ছিলেন না। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের দৃঢ় প্রোথিত অবস্থানের ফলে রক্ষণশীলতা নিছক প্রবণতা হয়ে না থেকে তাদের মৌলধর্ম হয়ে পুষ্টিলাভ করেছিল। শতাব্দীর শুরুতে রামমোহন রায় এবং শেষে কেশবচন্দ্র সেন শাণিত বৈদগ্ধ নিয়েও ধর্মীয় সংস্কারের জাল ছিঁড়তে তাই নানা ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বোধহয় এক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম।

উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীরা তাই শ্রেণিস্বার্থে প্রতিপক্ষ হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসককে চিহ্নিত না করে চিহ্নিত করেছেন, 'যবন'দের। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে যে শত্রু ছিল ইংরেজ, দ্বিতীয় সংস্করণে সেই শত্রু হয়েছে 'যবন'। এরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-পুনরুত্থানের চোরাবালিতে তলিয়ে গেছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অর্জিত মানবকেন্দ্রিকতা ও যুক্তিবাদ। এই হিন্দু প্রাধান্য বিস্তারকে ঔপনিবেশিক শক্তি অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

প্রথমদিকে বৃটিশ ভারতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদগুলিতে হিন্দু কর্মচারী নগণ্য ছিল। মুসলিম কর্মচারী প্রায় ছিল না। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে কাজে লাগিয়ে শাসন নিরঙ্কুশ করার প্রচেষ্টায় বৃটিশরা উদীয়মান হিন্দু বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোস করল। মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ সরকারি চাকরির উচ্ছিষ্ট পেয়ে খুশি হয়ে উঠলেন। মুসলিম সমাজের গোঁড়ামি এবং শিক্ষিতের হার কম হওয়ায় তারা সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের সমান হলেন না। তাছাড়া রাজশক্তি থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবার ফলে, মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষ ছিল প্রবল। তারা ইংরাজি শিক্ষা ও শাসনের প্রতি প্রাথমিক পর্বে খুব বেশি আস্থা প্রদর্শন করতে পারেনি। অপরদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বহুসংখ্যক মুসলিম প্রজা উৎখাত হয়েছিল ভিটেমাটি থেকে। এই সম্পর্কিত বিক্ষোভ, দস্যুবৃত্তি ও কৃষকবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। এল ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ। ধর্ম আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, অভিজাত মুসলিমদের বৃটিশ বিরোধ, এই সম্মিলিত প্রকাশের বিপরীতে ইংরেজরা হিন্দুত্ববাদকে প্রাধান্য দিতে থাকল।

যদিও একথা ভাবার কোনো ভিত্তি নেই যে, বৃটিশ-পূর্ব যুগে হিন্দু ও মুসলমানের

সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত সহজ ও মসৃণ, সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধির ফলেই যত বিভ্রাটের সূচনা। বস্তুত এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল ধরে যেমন আদান প্রদান ঘটেছে, তেমনই বিস্তর বাধা-ব্যবধানও রচিত হয়েছে। বৃটিশ যুগে একদিকে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর আবহ তৈরির চেষ্টা চলেছে, বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসের একাধিক মুসলিম চরিত্র যার সাক্ষ্য দেয়। আবার অপর দিকে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব' আইন সংশোধন নিয়ে এক ভোটাভুটি হয়েছিল। আইনটি পাশ হলে জমিদারদের খুব সমস্যা হতনা, মুসলিম রায়তদের কিছু সুবিধা হত মাত্র। কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে প্রস্তাবটি বাতিল করা হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যিনি এই বাতিলকরণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর নাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু।[৪]

এই পর্যায়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক অদ্ভুত স্ববিরোধিতা দেখা যায়। একদিকে তারা নবলব্ধ বুদ্ধির অহঙ্কারে সহজাত আবেগ ও সত্যকে অস্বীকার করেছেন। অপরদিকে সময়ের সাম্প্রতিক মাত্রার প্রতি তীব্র পক্ষপাতিত্বে ধারাবাহিক ইতিহাসের স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে খন্ডন করেছেন। একদিকে সব অচলায়তন ভাঙার প্রবল উচ্ছ্বাস, অপরদিকে চিরাভ্যস্ত সামাজিক ক্ষমতাচাপের কাছে নতজানু হওয়াই ছিল তাদের ভবিতব্য। সামন্তবাদের জীর্ণ উপাদানগুলিকে অক্ষুন্ন রেখে ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর যে বিন্যাস, সে ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার সহাবস্থান হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। তাই সুবিধাবাদী মনোভঙ্গি, অভিজাত, সমাজবিচ্ছিন্ন জীবনবোধ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ-মনোভাবনা আবেগ ও আচরণে অনন্বয়, জীবন ও যাপনে বহুধা বিভক্ত চৈতন্য এই সময়ের অপরিহার্য অঙ্গ।

ঔপনিবেশিক চেতনা কিভাবে এই সময়ের বুদ্ধিজীবীদের বোধকে গ্রাস করেছিল তার অজস্র উদাহরণ বাংলার সংবাদপত্রে এবং সাহিত্যে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন– *"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।"*[৫] বিদ্যাসাগর বলেছেন– *"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে বাংলাদেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"*[৬] রামমোহন রায় ইংল্যান্ড অধীশ্বর কে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে– *"প্রজাপীড়ক মুসলমান শাসকদের কবল থেকে বাংলার নিগৃহীত অধিবাসীদের উদ্ধার করেছে এবং আশ্রয় দিয়েছে ইংল্যান্ড।"*[৭] এমনকি রবীন্দ্রনাথও বলেন– *"রায়তদের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানেনা...একথা বলতে ইচ্ছে করেনা বা শুনতেও ভাল লাগেনা যে জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য।...কিন্তু অতবড় স্বাধীনতার অধিকার তারই যার শিশু বুদ্ধি নয়।"*[৮] সর্বসাধারণের যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম আর এক লেখক ,'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি অসামান্য মানবদরদী গল্পের লেখক শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে নায়ক সব্যসাচীকে দিয়ে বলান– *"নিরীহ চাষাভুষার জন্য চিন্তার প্রয়োজন নেই।... তাদের উত্তেজিত করার মতো পন্ডশ্রমের সময় নেই আমার। আমার কারবার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিয়ে।"*[৯] সেই শরৎচন্দ্রই ঐ একই উপন্যাসে অত্যন্ত যুক্তিবাদী উচ্চারণে আমাদের মুগ্ধও করে দেন। বলেন– *'সমস্ত ধর্মই*

মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার, বিশ্ব মানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।"[১০]

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। লেখকের নামের জায়গায় ছিল 'এ ইয়ং হিন্দু'। এই প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য ছিল ভারতের উপর ইংল্যান্ডের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে ভারতীয়রা যদি সর্বান্তকরণে মেনে না নেয় তাহলে দেশের জাতীয় জীবনে এক বিরাট ভাঙন দেখা দেবে। বাক্-সর্বস্ব বাঙালি বাবুরা যদি স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে তোলেন তা হলে ভাঙন ঠেকানো যাবেনা।...কেননা ক্ষমাশীল ইংল্যান্ডেরও ধৈর্যের সীমা আছে ইত্যাদি। 'দি হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় আক্ষেপের সঙ্গে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'সিপাহি বিদ্রোহ' সম্পর্কে এই মত পোষণ করেছিলেন যে, এই জঘন্য কান্ডের সঙ্গে লিপ্ত না থেকেও শিক্ষিতদের বেশ কিছু খেসারত দিতে হবে।

একদিকে আদ্যন্ত নিষ্ক্রিয়তা, অন্ধ অনুসরণ, মোহান্ধ অপপ্রচার, আত্মসম্মানহীন চাটুকারিতা, ইতিহাসের নিজস্ব গতির বিরুদ্ধে চলার প্রবণতা, তীব্র হতাশা, অস্থিরতা এই কাল-পর্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আবার অন্যদিকে ক্রমশ এই মোহদৃষ্টি মুছে গিয়ে, প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে নবার্জিত আত্মপ্রত্যয়ের ভূমির উপর দাঁড়াতে চেয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা। উপনিবেশ বিরোধী মনোভাবনা, চোখ ঝলসানো আধুনিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন, ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। যদিও বৃটিশ মুগ্ধতা সম্পূর্ণ মুছে গেলনা, তবু নানা স্তরে সংস্কার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল। ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোয় নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির ব্যবধান সম্পর্কে বেদনাবিদ্ধ সচেতনতা ছিল এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সৃজনধর্মী ও সংস্কার-মূলক উদ্যোগে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু ঔপনিবেশিক অবস্থানগত সীমাবদ্ধতার জন্য লক্ষ্যে পৌঁছানো ছিল প্রায় অসম্ভব। তাই ইচ্ছাপূরণের কল্পজগৎ বার বার তৈরি করতে হয়েছে ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতেই ছাপা হল একেবারে অন্যরকম মত। এক অনামা প্রাবন্ধিক এই জিজ্ঞাসায় ঝলসে উঠেছিলেন যে, আমাদের দেশের বিদ্যা যথেষ্ট কাজে লাগেনা কারণ, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে ইংরাজের শক্তি। পাশ্চাত্য বশীকরণ শক্তি ভারতীয়দের বিদ্যাবুদ্ধি গ্রাস করেছে, ফলে আজকের শিক্ষিত বাঙালি কেবল ক্ষমতাবান ইংরেজ তোষণ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন– *"ইংরাজি শিক্ষার ফলে মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসারতা বা চরিত্রের বলিষ্ঠতা কিছুই লাভ হয়নি। ছেলেরা শিখেছে কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামী করিতে।"*[১১]

আবার বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে আর্ন্তজাতিক চেতনার প্রথম অভিব্যক্তি লক্ষ করা গিয়েছিল রামমোহনের মধ্যে। সমকালীন ফ্রান্স, স্পেন, নেপলস্, পোর্তুগাল, ইটালি ও জার্মানির গণতান্ত্রিক আন্দোলন গুলির প্রতি তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। রামমোহনের আন্তর্জাতিক চেতনার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারী ছিলেন 'ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়'। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা আমেরিকার দাস-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। বিচার বিশ্লেষণ সহ আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রবাহের সর্বোত্তম প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটিতে। শিল্পবিপ্লবের

পরবর্তীকালে ইউরোপের দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমজীবীর শোষিত রূপটিকে 'সোমপ্রকাশ' তুলে ধরে। এছাড়া এই পত্রিকা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুক্তি আন্দোলনের যে ঢেউ উঠেছিল, তার কথা জানায়। পোলান্ড ও আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সার্থকতা 'সোমপ্রকাশ' তুলে ধরেছিল। এই প্রবল আনুগত্যের আবহে দাঁড়িয়েও ধনতন্ত্র বিরোধী গণজাগরণ সম্পর্কে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ' এক গভীর কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং ব্যক্তিগত পুঁজির অবলুপ্তির দিকটি অনেক বুদ্ধিজীবীকে আকৃষ্ট করেছিল।

উপনিবেশবাদ বিরোধী একটি জনমুখী চেতনা ক্রমশ বাংলার শিক্ষিত মানুষের কিছুজনকে এদেশে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ এবং শ্রমজীবী, মূলত কৃষকদের সঙ্গে তাদের বিরোধের প্রশ্নটি আবিষ্কারে সাহায্য করে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক্রমশ দানা বাঁধছিল বিদ্রোহ। পরাধীনতার একটা চাপা জ্বালা যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল তার আভাস পাওয়া যায়। 'জাতীয় কংগ্রেস'এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয়তাবাদী চেতনা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করেছে।

পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ছোটো-ছোটো বিদ্রোহ ঘটেই চলেছিল। মধ্যবিত্তরা যত সহজে বৃটিশ প্রভুত্ব গ্রহণ করেছিল, সাধারণ মানুষ তা করেনি। রংপুরে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ(১৮২৫), কোল বিদ্রোহ (১৮৩০), মহীশূরে কৃষক অভ্যুত্থান (১৮৩১),বাংলায় ওয়াহাবী আন্দোলন(১৮৩১),সাঁওতাল বিদ্রোহ(১৮৫৫), মহাবিদ্রোহ(১৮৫৭), খাসিয়া-জয়ন্তিয়া বিদ্রোহ(১৮৬০), নীলবিদ্রোহ(১৮৫৯-৬০),পাঞ্জাবে কুকা বিদ্রোহ (১৮৬৬),পাবনায় প্রজা বিদ্রোহ(১৮৭২), দাক্ষিণাত্যে মহাজন বিরোধী আন্দোলন(১৮৭৫), তেভাগা কৃষক বিদ্রোহ (১৯৪৬), ছোটনাগপুরে মুন্ডা বিদ্রোহ(১৮৯৫-১৯০০),মালাবার উপকূলে মোপলা বিদ্রোহ (১৯২১-২২),[১২] ইত্যাদি অপরিকল্পিত, সীমাবদ্ধ কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানগুলি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী ও কৃষকের,কারিগর ও সৈনিকের, সমাজের নিচের তলার মানুষের অসন্তোষের দলিল।

বস্তুত এই সময়ে প্রতীচ্যের চোখ-ধাঁধানো বিহ্বলতা কাটিয়ে উপনিবেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করেছিলেন অনেক মনীষী। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অন্তর্বর্তী স্থবিরতাকে ঐতিহ্যের সমার্থক ভেবে নিয়ে তার বিপরীতে ইউরোপ থেকে পাওয়া আলোকে সার্বিক মুক্তির নিঃশর্ত প্রাপ্তি হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন সেই সময়ের অনেক অগ্রণী মানুষ। ঔপনিবেশিক শাসককে পরিত্রাতা ভেবেছিলেন তাঁরা। আবার তাঁদের মধ্যেই জেগে উঠল প্রতিবাদী চেতনা। বলা যায় চৈতন্যের একপার্শ্বিক জাগরণ এবং কখনো কখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসারিত মানবতা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া নানা আন্তর্জাতিক ঘটনাস্রোতের খবর সংবাদপত্র বাহিত হয়ে আছড়ে পড়ছিল বাংলার উপকূলে। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুক্তি আন্দোলনের যে ঢেউ উঠেছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করে। বিভিন্ন দেশের স্বতঃস্ফূর্ত গণ বিদ্রোহের প্রতি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সার্থকতার বিষয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা একমত হতে থাকেন। চিনের যুদ্ধ, তাইপিং বিদ্রোহ, ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্তানে বৃটিশ প্রভুত্ববাদের কদর্যরূপ, ভিয়েতনামের ফরাসি-বিরোধিতা ইত্যাদি খবর, বাঙালির মতো উপনিবেশের চাপে নিঃস্ব জাতিগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের স্বপ্নকে উজ্জীবিত করেছিল। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি, শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, মানবতাবিরোধী মুনাফালোভী কাজ সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের চেহারাটি ক্রমশ স্পষ্ট করে তুলেছে। ফরাসি-বিপ্লব, চার্টিস্ট আন্দোলন ইত্যাদির খবর বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করেছিল। প্রাশিয়ার যুদ্ধ, ফ্রান্সের যুদ্ধ, প্যারী কমিউন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সাথে ইউরোপে 'কমিউনিস্ট' নামে একদল ব্যক্তির গতিবিধি ও বিশিষ্ট মতাদর্শের খবরও বাংলায় এসে পৌঁছায়।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশবিপ্লবের পর 'শ্রমিক ইন্টারন্যাশনাল' এর বাংলা রূপান্তর হয় নজরুলের হাতে। *"জাগো অনশন বন্দী, ওঠ রে যত জগতের যত লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!"*[১৩]এই গান আলোড়িত করেছিল চেতনা। রাজরোষে নিষিদ্ধ হল নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশি'। নজরুলের সম্পাদনায় 'লাঙল' পত্রিকায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসের অনুবাদ করেন ধারাবাহিক ভাবে। রুশবিপ্লব বাংলার রাজনৈতিক চিন্তায়ও প্রভাব ফেলতে শুরু করল। বলশেভিকবাদ তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে ছিল 'জুজুবুড়ি'র মতো। কারণ সারা পৃথিবীতে ক্রমাগত মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব বাড়ছিল। ত্রিশের দশকের শেষে মাও-যে-দঙ-এর নেতৃত্বে সংহত হয় চিন। স্পেনের স্বৈরাচারী শাসক ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইউরোপের সকল প্রগতিশীল মানুষ যোগ দেন। সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকে। হিটলারের উত্থান, আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদের নব উত্থান, ধনতন্ত্রের সংকট, বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন মানবতার নতুন শক্তি হয়ে মানুষকে বলিষ্ঠতা দিল। প্রগতি আন্দোলনের স্রোতোধারা ভৌগোলিক সীমারেখা ভেঙে গড়ে তুলল এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছিল। তাই যে বৃটিশ সরকার উপনিবেশের প্রথম স্তর থেকে প্রচন্ড দমন-নীতির দ্বারা ভারতীয়দের যাবতীয় প্রতিবাদ ও বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছে, সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ হঠাৎ আপোস আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী হল এক বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে। ফ্যাসিবাদের পরাজয় ও গণতন্ত্রের সাফল্য, সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যতম শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফ্যাসী-বিরোধী সংগ্রামে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিগুলির দুর্জয় প্রতিরোধ, চিনে গণমুক্তি সংগ্রামের জয়লাভ, ভিয়েতনামে গণমুক্তি সংগ্রামের সাফল্য, কোরিয়ায় জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশদের প্রচন্ড আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধির ফলে বৃটিশরা দ্বিতীয় শ্রেণির শক্তিতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় বলপূর্বক ভারতের উপর ক্ষমতা বজায় রাখা এবং ভারতে নিত্যনতুন গণ-আন্দোলনের মোকাবিলা করা সম্ভব নয় তা বৃটিশরা বুঝতে পারছিল।

তাই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অর্জিত হল ভারতের স্বাধীনতা। ঔপনিবেশিক কবল-মুক্ত এক সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছিল। জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করে সামন্ততন্ত্রকে আঘাত করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে ভারত বেছে নিয়েছিল একটি স্বাধীন পুঁজিবাদী বিকাশের পথ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনই ছিল লক্ষ্য।

কিন্তু স্বাধীনতার অল্প কিছুদিন পরেই এই সত্য প্রকটিত হয়ে উঠল যে, পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে, দুশো বছরের শোষণ-ক্লিষ্ট ভারতকে পুনর্নির্মাণ করা সম্ভবপর নয়। আর সেই চেষ্টাও খুব ভালভাবে হয়েছিল একথা বলা যায়না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে, দীর্ঘকালের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অসংখ্য শিকড় যা ভারতের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে নানা দিক দিয়ে পঙ্গু করে রেখেছিল, তাকে অপসারিত করার কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে স্বাধীন ভারতে তাকে আরো লালন ও পুষ্ট করা হয়েছে। বৃটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা তো দূরের কথা এই পুঁজি ভারতের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবেনা কিংবা এই পুঁজি থেকে অর্জিত মুনাফা ভারতেই পুনর্বিনিয়োগ করতে হবে এই ব্যবস্থাটুকু করাও সম্ভব হয়নি। বৃটিশ সৃষ্ট জমিদারি-প্রথা লোপ হলেও প্রকৃত ভূমি সংস্কারের দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতির গঠনকে পরিবর্তিত করার প্রচেষ্টা বেশিরভাগ রাজ্যে হয়নি। যদিও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এটাই ছিল মূল দাবি। ফলে সামন্ত শ্রেণি ও ধনী কৃষকেরা পুষ্ট হতে থাকল। সাধারণ কৃষকের দারিদ্র্য বাড়তে থাকল। এমনকি বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কৃষিপ্রধান ভারতকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা গেলনা। পি.এল ৪৮০ মারফৎ ভারতকে আমেরিকার উদ্বৃত্ত নিম্নমানের খাদ্যের ডাম্পিং ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে স্বাধীন ভারত প্রথম কুড়ি বছর ভয়াবহ খাদ্য সংকটে ভুগেছে। আর এই সংকট, স্বাধীনতা সম্পর্কিত মোহ থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দিয়েছে। দেশের প্রকৃত অবস্থা ও শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজ কাঠামোর স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করেছে।

ভারতের সংবিধান রচনার জন্য যে 'কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলী' গঠিত হয়েছিল, তাতে শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য শোষিত অত্যাচারিত অংশের আস্থাভাজন মানুষদেরই প্রতিনিধি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বণিক, শিল্পপতি, রাজন্যবর্গ, জমিদার ও উচ্চবর্গের প্রতিনিধিদেরই ছিল সংখ্যাধিক্য। বৃটিশ অনুরাগী রায়বাহাদুর ইত্যাদিও ছিলেন বহুল পরিমাণে। ফলে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে শোষকের স্বার্থরক্ষাই গুরুত্ব পেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত শৃঙ্খল দূর করবার কোন তাগিদ না রেখে 'মৌলিক অধিকার' ইত্যাদি কিছু মনভোলানো কথার প্রলেপের নীচে মূলত ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের 'গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'-কেই অনুসরণ করা হল। যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠনের কথা বলা হলেও ক্রমশ রাজ্যগুলির অধিকার সংকুচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অসমতা বেড়েছে। বঞ্চনার মনোভাব থেকে জন্ম নিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা। ঐক্যের মনোভাব গড়ে উঠতে পারেনি। জাতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির একচেটিয়া হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

এই সময় থেকেই নব্য-উপনিবেশবাদের রূপটি ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। জাতীয়

কংগ্রেস যে গণ-আন্দোলনের পথ পরিহার করে আপোস আলোচনাকেই স্বাধীনতার আগে কেন বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল, সেই সত্যও সামনে আসতে থাকে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের প্রবল বিরোধী হয়েও, দেশভাগের বিনিময়ে ক্ষমতা হস্তান্তরকে মেনে নিয়েছিল আমাদের দেশের এলিটরা। আবার এই এলিটদের সাহায্য নিয়েই উত্তর-ঔপনিবেশিক কালখন্ডেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিন্নতর পদক্ষেপ লক্ষ করা গেল। স্বাধীনতা-পরবর্তী উন্নয়নের জন্য আবারও সাম্রাজ্যবাদের কাছেই ঋণী হলেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ। বৃহৎশিল্প, সেচ, বাঁধ, রাস্তা, সেতু কিংবা যন্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনে মহান বন্ধুর মতো আবারও সাম্রাজ্যবাদ ভারতের সার্বভৌম রাষ্ট্রকাঠামোয় প্রবেশ করল। ভারতে স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যত স্বপ্ন, যত উদ্দীপনা মুকুলিত হয়ে উঠেছিল, স্বদেশি শাসকের প্রকৃত পুঁজিবাদী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই মুকুলগুলি ঝরে যেতে থাকল। ক্রমশ দেখা গেল ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির একটি পর্যায় সাতচল্লিশে শেষ হয়ে নব্য-উপনিবেশবাদের ছদ্মবেশে আবারও ভারতীয় জীবনের উপর দখলদারি কায়েম করেছে।

এই প্রতাপের বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছে মানুষ। কিন্তু নানা ভাবে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ চিন্তায়, চেতনায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, বিশ্বাসে, ভাবনায়, রুচিতে, জীবনধারণের প্রতিটি পর্যায়ে ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব-নিয়ন্ত্রিত বোধগুলি এত প্রবল ভাবে উপস্থিত ছিল যে, উপনিবেশ পরবর্তী কালে দেশের স্বাধীন সত্তাটি বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি। অন্য সব উপনিবেশের মতো ভারতকেও ক্রমাগত খুঁজে চলতে হয়েছে নিজের অস্তিত্বের শিকড়। এই পর্বেও নব্য-উপনিবেশবাদ তাকে স্বাধীনভাবে পথ চলতে দেয়নি। ছেলেভুলানো সার্বভৌম রাষ্ট্রের খেতাব দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে সুকৌশলে। যে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটি ইংল্যান্ড থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে সুদূর আমেরিকায়।

তাই এই সময়ের মানুষ যতবার একটা সমগ্রতার ধারণা নিয়ে ইতিহাসকে বুঝতে চেয়েছেন, সেই ধারাবাহিকতার বোধের সঙ্গে নিজের বর্তমানকে গ্রথিত করতে চেয়েছেন, ততবারই তাদের বিফল হতে হয়েছে। বস্তুত আমাদের সমাজ-রাজনীতির ধারাবাহিকতাকে ধ্বংস করে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ইতিহাসের কার্যকারণ শৃঙ্খলা অস্ত্রের জোরে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তাকেই নিজস্ব বলে মানতে বাধ্য হয়েছি। এই অনন্বয়, অসামঞ্জস্য স্বাধীনতা পরবর্তী কালে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা সংস্কার' প্রবন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন– *"যখন দিনেমার এবং ইংরেজরা আয়ারল্যান্ড আক্রমণ করে, তখন এই সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুল সঞ্চিত পুঁথিপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে।...অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল, তখন আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্ত্বিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।*

এই রূপে আয়ারল্যান্ড বাসীরা জ্ঞানচর্চা থেকে বঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহাদের ভাষা নিকৃষ্ট ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে ন্যাশানাল স্কুল প্রণালীর সূত্রপাত হইল। জ্ঞানপিপাসু আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষ গুলি বিচার মাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে ইহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। ...শুধু ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো

বন্ধ হইল, আইরিশ ভূ-বৃত্তান্তও ভাল করিয়া শেখানো হইতনা।... ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল।" ১৩

ভারতেও উপনিবেশ পরবর্তীকালে একটা শিকড়হীনতার যন্ত্রণা অথবা একটা সামঞ্জস্যহীনতার বোধ মানুষকে আক্রান্ত করেছে। আসলে আমাদের দেশের সমাজ যেন দুটি পৃথক কালখন্ডে বিভক্ত হয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার আগের ও সাম্রাজ্যবাদ চলে যাবার পরের দুটি পৃথক সংস্কৃতির দোলাচল চলতে লাগল। ভারতে অনেক বহিরাগত জাতি আগেও এসেছিল। শক, হুণ, তুর্কি, পার্সি, আফগান, পাঠান, মোগল আমলেও এই ভূখন্ডের ক্ষেত্রে নানা সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন ঘটেছিল। কিন্তু ইংরেজ আগমনের বিষয়টি ছিল আলাদা। অন্য জাতিগুলির মতো ইংরেজরা শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্বে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, কিংবা তারা শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারে আগ্রহী ছিলেন না। অধিকৃত মানব-সমাজটির জীবনভঙ্গি ও চিন্তাস্রোতে অধিকার কায়েম করা ছিল তাদের পক্ষে জরুরি। কারণ প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর চিন্তা শৃঙ্খলা আলাদা আর চিন্তাশৃঙ্খলাই গড়ে তোলে সেই জাতির ভোগপ্রবৃত্তির আদল। ভোগপ্রবৃত্তির থেকে তৈরি হয় তাদের প্রয়োজনের তালিকা এবং উৎপাদন কাঠামো। তাই ব্যবসায়ী শাসক চেষ্টা করে অধিকৃত উপনিবেশের মানুষগুলির চিন্তাশৃঙ্খলায় পরিবর্তন আনতে। তাদের ভোগ্যসূচি এক করে ফেলতে।

এই প্রক্রিয়া ইংরেজরা চলে যাবার পরেও ভারতীয় চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। যাকে আমরা ঔপনিবেশিক খোঁয়ারি বলতে পারি। বস্তুত এক অভিন্ন পরিবেশ গড়ে তুলে শর্তের পর শর্ত আরোপ করে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ভারতও অন্য অনেক ঋণগ্রস্ত রাষ্ট্রের মতোই নিজের সীমানা ও বাজার নব্য-উপনিবেশবাদের কাছে উন্মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে। জলের দামে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় শিল্প, কুটীর শিল্প, সমবায় উদ্যোগ। কৃষি ইত্যাদি আবারও ধুঁকতে শুরু করেছে। ষাটের দশকের শেষ পর্যায়ে ও সত্তরের দশকের প্রথম থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদ তার বাইরের রূপ, বিশেষত কলাকৌশলের পরিবর্তন করেছে। তথ্য-প্রযুক্তির চূড়ান্ত উন্নতির শাখায় ভর করে, কখনো উন্নয়ন, কখনো উত্তর-আধুনিকতার নাম করে, বন্ধুবেশে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে, পুঁজিবাদ তার দমনকারি বাচনের মূলোৎপাটন করতে চেয়েছে। পুঁজিবাদ কেবল নব কারিগরি আবিষ্কার বা বাজার দখলের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীকে করায়ত্ত করতে তৎপর হয়েছে তাই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অর্থাৎ কাঠামোয় ও উপরি কাঠামোয় তাদের মূল কাজ হল ছলে-বলে-কৌশলে দেশের সীমানা মুছে দেওয়া বা উৎপাদিত দ্রব্যের ও পুঁজিলগ্নির প্রলোভন দেখিয়ে ভাবধারায় একাকার করে দেওয়া। আজন্ম লালিত মূল্যবোধগুলিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পাঁকে ডুবিয়ে সামাজিক দায়বোধকেও ধ্বংস করতে চায় পুঁজিবাদ। তাই নয়া-উপনিবেশবাদ মানুষকে ভাবতে শেখায়, মানুষ একা। কখনো ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে, কখনো লিঙ্গ-স্বাধীনতার নামে, মানবিক পারম্পর্যরহিত, ঐতিহাসিক উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন এক চৈতন্য গড়ে তোলবার চেষ্টা চলে।

প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি-বিপ্লবকে হাতিয়ার করে নয়া-উপনিবেশবাদের প্রভাব গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলেছে। বিপুল ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে ও শহরে। পণ্যায়ন প্রক্রিয়ার

আগ্রাসনে মানুষের জগৎ ও দৃষ্টিভঙ্গি রিক্ত হয়ে পড়েছে। পণ্যায়নের যুক্তি শৃঙ্খলার কাছে আপাতভাবে পরাভূত হয়েছে যাবতীয় নান্দনিক সংবেদনা। পণ্যজীবী প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির চতুর ছক অনুযায়ী পাঠকৃতিতে মিথ্যার স্তূপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। একটি বিশেষ নান্দনিক বৈদগ্ধ ও পরিশীলনকে গ্রহণীয় মান হিসাবে স্থির করে, সব মানুষকে সেই মানে পৌঁছাতে বাধ্য করছে আজকের সভ্যতা।

বুদ্ধিজীবী, প্রযুক্তিবিদ্ যারা সমাজে মানসিক শ্রমদান করেন, তারা সামাজিক সমৃদ্ধির সিংহভাগের অংশীদার হতে চাইছেন। আরো সুবিধা, আরো ভোগের দর্শন তাড়িত হয়ে তারা সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধা, বেদনা-বিক্ষোভ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। নব্য-ঔপনিবেশিক চেতনা এই শ্রেণিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়না, বরং এদের দ্বারাই মানবতার লড়াইকে পার্থিব সমৃদ্ধির লড়াইয়ে পরিবর্তিত করতে চায়। গর্বাচভ যা রাশিয়ায় চেয়েছেন, মাও-যে-দং এর সময়ে লিউ-শাও-চি যা চিনে চেয়েছেন, লেনিনের সময়ে বুখারিন যা চেয়েছিলেন, এ সেই বিশিষ্ট মত।

নব্য-উপনিবেশবাদ তাই সাবধানতার সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের জগৎকে নিজের একচেটিয়া দখলে রাখতে চায়। খুঁজে নেয় ক্রীতদাস লেখকদের। সেই লেখকেরা ক্রমাগত এক বিপন্ন ধ্বস্ততার কথা বাস্তবতার নামে রচনা করে যায়। অনুষঙ্গ হিসাবে থাকে, পোষাকি রাজনীতির হস্তক্ষেপ, সংখ্যাহীন ভুল তথ্য, যৌনতার সুনিপুণ প্রয়োগ, আধ্যাত্মিকতার ছদ্ম ভান এবং অবশ্যই মার্কিন প্রীতির এক অপার্থিব জগৎ। মানব সমাজের এই একত্রীকরণ প্রক্রিয়া বহু সমাজে বা বলা যায় উপনিবেশের গ্রাস থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে যে নতুন সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তুলতে চাইছে তা সমস্ত ধরনের জাতিগত, সম্প্রদায়গত নিজস্বতাকে আক্রমণ ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রতিটি দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে পুঁজিবাদী শক্তির দ্বন্দ্ব তাই তীব্রতর হচ্ছে।

সাহিত্যে বিকৃতি রোপণ করে, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অভ্যন্তরীণ সংকট তৈরি করা হচ্ছে। জীবন ও জীবিকাকে তার পল্লিমুখিনতা থেকে, সার্বজনীনতা থেকে সঙ্কুচিত করে, তাকে ব্যক্তিমুখী ও স্বার্থপর করে তোলা হচ্ছে। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রাণশক্তিকে নিংড়ে আত্মমগ্ন করে তোলার সর্বগ্রাসী চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক উপনিবেশ গড়ার পরিবেশ যখন রুদ্ধ, তখন নয়া-উপনিবেশবাদ এক সীমানাহীন আর্থিক উপনিবেশ গড়ে তুলতে চায়। ভোগবাদের মোহন হাতছানিকে সামনে রেখে বাজার সম্প্রসারণ ও মানুষের মনোজগৎকে হাতের মুঠোয় নেবার প্রচেষ্টায় তারা অবাধে ব্যবহার করেছেন শিল্পী সাহিত্যিকদের।

'গ্যাটচুক্তি' পরবর্তীকালে ভারতে মানবিক বিদ্যার প্রতিটি শাখায়-প্রশাখায় পণ্যায়নের দৃপ্ত পদক্ষেপে চিন্তা ও গ্রহণের আঙ্গিক ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। সমস্ত দুনিয়ায় যাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দখলদারি এখন ব্যতিক্রমহীন সত্য, তারা সেই সব বিদ্যা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে যা জানলে মানুষের চেতনা বিকাশ লাভ করবে, তা না জানতে দেবার অতি সূক্ষ্ম, গভীর আয়োজন সমাজে সক্রিয় থাকছে। যে শিল্প কেবল মাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কথা বলে তাই কেবল কাম্য আজকের সমাজে। স্বাধীন কণ্ঠস্বরের কোন শিল্পী তাই ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের কাম্য নয়। ফলে ক্রীতদাস লেখকেরা যা সৃষ্টি করেন, তা শিল্পের নামে

সত্যভ্রমের মায়াজাল।

সত্তর দশক থেকে সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনগুলি ক্রমশ কোণঠাসা হয়েছে। চিলির ভাঙন, চিনের হুমকির আওতায় এসে যাওয়া, কিউবার কোনক্রমে টিকে থাকা, মানুষকে হতাশ করেছে। নতুন যে সব বিপ্লবী রাষ্ট্র উঠে দাঁড়িয়েছিল তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ঘিরে ফেলা হয়েছে কিংবা আক্রমণ করে ও গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। 'অ্যাঙ্গোলা' থেকে 'ভিয়েতনাম' কোনো উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজকেই উন্নতির মডেল হিসাবে গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। নব্বইয়ের দশকে সোবিয়েত রাশিয়ার পতন ও সমাজবাদের পিছু হটার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রটি আরও প্রসারিত হয়েছে। জীবন ও যাপনের প্রতিটি স্তরে সেই আগ্রাসন আমাদের ভুলপথে চালিত করার চেষ্টা করে চলেছে। তাই আমাদের এলিট ক্লাশ আজও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে ফেলে। সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, নাটকে, শিল্পকলায়, ভাবনায়, যাপনে, আধুনিকতার বোধে সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী মডেলটিকেই অনুসরণ করে চলতে হয়। আর এই অনুসরণের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর অনৈতিক শাসন-শোষণের তীব্রতা ম্লান হয়ে আসে। সাম্রাজ্যবাদ যে আমাদের সভ্যতা ধ্বংস করে, ইতিহাস বিচ্ছিন্ন করে, ঐতিহ্য ধ্বস্ত করে, জাতিগত স্বকীয়তাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দিয়েছে এ সত্য ম্লান হয়ে যায়। আমরা আবারও মোহগ্রস্থ হয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে নতজানু হই।

উত্তর ঔপনিবেশিক কালেও গর্ববোধের উৎস ও সূত্র সেই পাশ্চাত্য কেন্দ্রটি। কেননা এখনও সংজ্ঞা তৈরির কারখানা সেইটিই। এখনও সাম্রাজ্যবাদই নিয়ন্ত্রণ করে দেয় আমরা আমাদের ভাষায় কটা বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতে পারলে আধুনিক বলে চিহ্নিত হব, আমাদের লোকসংস্কৃতিকে আমরা কতটা গুরুত্ব দেব ইত্যাদি। তাই দেখা যায় ইংরেজদের গেজেটিয়ার গুলিকেই প্রামাণ্য বলে বিশ্বাসযোগ্যতা দেন স্বাধীন দেশের জেলা শাসকরা। সেই গেজেটিয়ার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো আপাত প্রগতিবাদী গবেষক তার দেশের ইতিহাস বা ভাঙাগড়াকে খোঁজেন তখন সেটাই খুঁজে পান, যেটা তার হাতে দিতে চেয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। রচনা করেন সেই ভাষ্য, যা আগামীকালের হাতে তুলে দিতে চায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ।

তাই আমাদের দেশে, বৃটিশ শাসন-প্রণালী অবিকৃত রেখে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জনগণকে এটা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে যথার্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের মতামত নিয়েই তাদের গ্রামীণ জীবন পরিচালিত হয়। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই বোঝা যায় মূল ক্ষমতাটি নিহিত থাকে আধিপত্যবাদী সদরটির হাতে। তাদের কাজ প্রান্তবাসীর উচ্ছৃঙ্খলা ও দ্রোহকে দমিয়ে রাখা। গ্রাম পঞ্চায়েত মুলত এই কাজে সদরটিকে সাহায্য করে। প্রান্তিক মানুষের নয়, আধিপত্যবাদী সদরের প্রতিনিধিত্ব করে সে।

এগুলি না বুঝতে দেবার জন্য, তৃতীয় বিশ্বে চেতনাকে স্থবির করে দেবার জন্য, প্রতিটি গণমাধ্যম নিয়োজিত হয়েছে। উপগ্রহ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অজ পাঁড়াগা থেকে মহানগর পর্যন্ত একই জীবন-যাপনের মানকে প্রচার করা হচ্ছে। উপনিবেশকালে যে স্বকীয়তার বিনষ্টি ছিল প্রচ্ছন্ন, নব্য-উপনিবেশকালে তা অনেক বেশি প্রকট ও ব্যপক। এ কালে জ্ঞানও

পীড়নের হাতিয়ার। বাজারের বিক্রয়যোগ্যতা দিয়ে নির্দ্ধারিত হয় জ্ঞানের মূল্যমান। কোন গ্রন্থটি বহু পঠিত হবে, কোন্ গ্রন্থটি কখনই পাঠকের হাতেই পৌঁছাবেনা সেটাও নিয়ন্ত্রণ করেন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা। এক অবক্ষয়ক্লিষ্ট সমাজ ভাবনাকে ব্যতিক্রমহীন একমাত্র সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা এই পর্যায়ে দেখা যায়।

জ্ঞানের এই একদেশদর্শিতা মানুষকে ক্রমশ ভোগ্যপণ্যের মোহে জারিত করেছে। সাধারণ মানুষ আর ঈশ্বরী পাটনীর মতো বলতে পারেনা–আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। জীবনের প্রতিটি স্তরে বহুজাতিক সংস্থা নির্মিত পণ্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। সন্তানকে মানবিক সুস্থতা দেবার পরিবর্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর মার্কিন-মোহ দিতে চান অভিভাবকরা। এক অদ্ভুত বিকার, যাকে অনায়াসে মাস্-হিস্টিরিয়া বলা যেতে পারে তা আমাদের সমাজে ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের সাবলীল, মানবিক চেতনাবাহী সংস্কৃতির ধারাস্রোত পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠেনি, বরং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক উন্মার্গগামিতা গ্রাস করেছে সমাজকে। বিচ্ছিন্নতায়, বিরোধে একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের দূরত্ব বাস্তব হয়েছে। আদান-প্রদানহীন ঐতিহ্যে গড়ে উঠেছে ছিন্নমূল সংস্কৃতি।

এই ঘন অন্ধকারে, নব্য-উপনিবেশবাদের প্রবল আগ্রাসনের মধ্যেও অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর মতো জেগে ওঠে প্রতিস্পর্ধী মূল্যবোধ। উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ। এই বোধের সবচেয়ে বড় দায় জীবনের সর্বস্তরে সবরকম ছদ্মবেশের উন্মোচন। উপনিবেশের করাল গ্রাসে নিঃসাড় হয়ে যাওয়া মনের পরিবর্তন করে নতুন কিশলয়ের জন্ম দেওয়ার কথা বলে এই মূল্যবোধ। তাই প্রান্তিকায়িত মানুষের কণ্ঠস্বর ক্রমশ সোচ্চার হয় উপনিবেশোত্তর কথনে। বিকল্প মূল্যবোধের নির্মাণ আর পুরাতন মূল্যবোধের বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে চলে এই কঠিন যুদ্ধ। উপনিবেশোত্তর জনগোষ্ঠী নয়া-উপনিবেশবাদের প্রতাপে অত্যন্ত কোণঠাসা হলেও তাদের অন্ধকার জীবন থেকে উৎসারিত হয় তিমির বিনাশী আলোকরেখা।

বস্তুত এই প্রতিবাদ উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য হলেও এর সূচনা আরো অনেক আগে। উপনিবেশবাদ যখন শাসিতের সমাজে সব রকম অধিকারে অধিকারী হয়ে নেটিভ জনগোষ্ঠীর স্বাধীন চিন্তাকে ক্রমশ আঘাত করতে শুরু করে, তখনই প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ পর্ব। উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ জ্যামিতিক নিয়মে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। প্রবল দমন-পীড়নের মধ্যেই আধিপত্যবাদী শক্তির প্রতিবেদনে অন্তর্ঘাত করবার আগ্রহ আমাদের বিস্মিত করে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন বা সুকুমার রায়ের কলমে এর অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে।

চল্লিশের দশকে সারা বিশ্বব্যাপী যে প্রতিবাদের আবর্ত তৈরি হয়েছিল, অবিভক্ত বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলনা। দেখা যায় আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও নান্দনিক স্তরে সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রবণতা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস ও প্রকরণকে অস্বীকার করে ও প্রত্যাহ্বান জানিয়ে, সব ধরনের পূর্ব নির্দ্ধারিত মানকে চূর্ণ করে, বিকল্প মূল্যবোধের জন্ম দিতে

চেয়েছিল এই কাল। সত্তর ও আশির দশকে প্রযুক্তি বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে আরো সুনিপুণ পুঁজিবিশ্বের সঙ্গে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধের লড়াই তীব্র হয়ে উঠেছে। 'পেরেস্ত্রৈকা'র পর তা নতুন মাত্রা পেয়েছে। সাহিত্য ও শিক্ষার বাণিজ্যকরণের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে মানুষকে এক অভিন্ন লক্ষ্যে সংগঠিত করার দায় সৎ সাহিত্যের। ব্যক্তিতান্ত্রিকতার ব্যূহ থেকে মুক্ত করে নিখিল মানবতার সমস্যাগুলিকে চৈতন্যে সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবাদী এবং গঠনমূলক সাহিত্যের এক বিরাট ভূমিকা আছে। তাই রুমানিয়ার জাতীয় কবি মিখাইল এমিনেস্কোর কবিতা একশ বছরের দীর্ঘ বিস্মৃতির পর আবার মানুষের হৃদয়ের কাছে চলে আসে। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সঙ্গে কাঙাল হরিনাথ শরীরের শেষ রক্তবিন্দু মিশিয়ে দেন। চিলিতে খুন হওয়া কবি লোরকা, কিংবা মৌলবাদের হাতে খুন হওয়া নাট্যকার সফদর হাসমি, আজও আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেন।

যখন বিশ্বের শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ সকল প্রান্তিকায়িত জনগণের সামাজিক ও নান্দনিক স্বকীয়তাকে মুছে ফেলতে চাইছে, তখন উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধকে সংগ্রামী তৎপরতায় প্রতিষ্ঠা দেবার একটা প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এক আপোসহীন সংগ্রামী মানসিকতা এই মূল্যবোধের মৌল চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীকরণপ্রবণ সন্দর্ভে হস্তক্ষেপ করে সামাজিক ও নান্দনিক প্রতাপের অবসান ঘটিয়ে সূচনা হয় পুনঃপাঠের, প্রতিসন্দর্ভ নির্মাণের। অসংগঠিত ব্রাত্য জনকে যদি নিজের কণ্ঠস্বর ফিরে পেতে হয় তবে কেন্দ্রীয় নব্য-ঔপনিবেশিক আবরণকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখান করতেই হবে। যে কোনো বিন্দু থেকে শুরু হবে অপ্রাতিষ্ঠানিকতার বার্তা।

এজন্য শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন অতীতকে জানা, যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অতীতকে বিশ্লেষণ করা। যে অতীতের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার যথার্থ উৎসটি। উত্তর উপনিবেশকালের এই অন্বেষণবাদী দৃষ্টিকোণ প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক সম্পর্ককে খুঁটিয়ে যাচাই করে। ইতিহাসের একরৈখিক ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে। জগৎসংসার বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী ধারণাকে নস্যাৎ করে। রাজনৈতিক ও আর্থিক পালাবদল ঘটালেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শুভবোধ যে বদলায় না, নৈতিক ধ্যানধারণা যে একই থাকে, সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

সাম্রাজ্যবাদের গোড়াপত্তন থেকেই বাংলার পুরাতন ইতিহাস কে ভীষণ ভাবে আঘাত করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজের ইতিহাসকে মানব-ইতিহাস বলে চালিয়ে দিয়েছে। নিজেদের স্বার্থে উপনিবেশের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। নিজেদের তথাকথিত আধুনিকতাকে এক এবং অদ্বিতীয় প্রমাণ করার জন্য উপনিবেশের ঐতিহ্যশালী মডেলটিকে ধুলিস্যাৎ করেছে। 'সুসভ্য' হয়ে ওঠার এই সাম্রাজ্যবাদ নির্দ্ধারিত প্রক্রিয়ার প্রতি প্রশ্ন তোলে উপনিবেশোত্তর চেতনা। ঔপনিবেশিক সমাজ এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, 'আধুনিকতার' তুলনায় তারা নিকৃষ্ট ও অনুন্নত। নেটিভ সমাজ তার নিজস্ব নান্দনিকতার জন্য কুণ্ঠিত হওয়াকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল। উন্নয়নের নামে চাপানো ঐতিহ্য বিচ্যুতি, আর আধুনিকতার নামে দেওয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি সবই ছিল সাম্রাজ্যবাদের হাতে তৈরি। উত্তর উপনিবেশের চেতনা এই দ্যোতকগুলিকে উপড়ে ফেলতে চায়।

কিন্তু উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ নিয়ে, যখন একজন লেখক এই প্রচলিত সমাজ

T2912
Bengali

কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন সমাজ তার প্রতি প্রথমে উদাসীনতা পোষণ করে এবং সেই লেখকের ঔদ্ধত্যকে ক্ষমাহীন চোখে দেখে। তাই যে কোনো মানবিক চেতনা সম্পন্ন সৎ শিল্পীর সঙ্গী যন্ত্রণাবোধ। টাকার অংক, প্রচারের কৌশল, পুরস্কারের প্রলোভন কিংবা প্রাণের সংকট কোনো কিছুর দ্বারা বিচলিত না হয়ে সমাজের নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে অস্বীকার করে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবু দেখা যায় সৎ শিল্পীদের কাছে এগুলি সমস্যা হয়না, বরং তাঁদের কাছে চ্যালেঞ্জ হল যে, তাঁরা কতোটা স্পষ্ট ভাবে, সততার সঙ্গে সমকালকে চিহ্নিত করতে পারবেন। একজন দায়বদ্ধ শিল্পী তার কলমকে মানুষের কথায় সোচ্চার করে তুলতে চান। অন্ধকারের পক্ষে মানুষকে ভুল পথে চালিত না করে সঠিক পথ দেখাতে চান তাঁরা। ক্ষণকালের মুঠো ভরিয়ে তুলে, সাম্প্রতিকের দাবি মেটানোর জন্য দ্বান্দ্বিক কাল পরিক্রমাকে প্রত্যাখ্যান করে, ধীরে ধীরে ভাবাদর্শের কাঠামোকে বদলে দেবার যে চক্রান্ত চলেছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো একজন শিল্পীর পক্ষে বিশেষ জরুরি। অস্তিত্বের সামাজিক দায় যখন ক্ষীয়মান, পণ্যসর্বস্ব চিন্তা প্রণালীর অজস্র আক্রমণে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বিশ্বস্ত সৃজন পরম্পরা যখন ভেঙে পড়তে চলেছে, তখন লেখকের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন, জীবনকে দেখার বিশুদ্ধতা ও জীবন বীক্ষণের সমগ্রতা। এই সংকট কালে লেখককে খুঁজে নিতে হয় তার পথ। অনুসন্ধান করতে হয় নিয়ত। সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হয়ে অবিষ্কার করতে হয় নতুন পৃথিবী গড়ার পদক্ষেপগুলিকে।

সূত্রনির্দেশ:-

১. ১৮২৩

২. ১৮১৮-১৮৩৫

৩. প্রবন্ধ-শিক্ষার বিকিরণ, গ্রন্থ-শিক্ষা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ;আশ্বিন ১৩৯৭,পৃ.২১৬

৪. প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য,(সমাজের মাত্রা এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস) ঃ চৈতালি ঘূর্ণি',এক্ষণ',একাদশ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা: শারদীয় ১৩৮২ ;পৃষ্ঠা-৭৪

৫. 'বঙ্গদেশের কৃষক'-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ,প্রবন্ধ খন্ড,সাক্ষরতা প্রকাশন,পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি:তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৭৭;পৃ.৩০৯,৩১০

৬. 'বাঙ্গালার ইতিহাস'(২য় খন্ড)ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,সাক্ষরতা প্রকাশন,পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪;পৃ.২৭৫

৭. রামমোহন রায়-'ডিউস অন সেটেলমেন্ট ইন ইন্ডিয়া বাই ইউরোপিয়ানস্', রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ,কলকাতা ১৯৭৩;পৃ.৫৩১

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' গ্রন্থের ভূমিকা,বিশ্বভারতী,১৩৫১;পৃ.৮

৯. উপন্যাস- পথের দাবী-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,অধ্যায়-২৬,শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ,এম. সি .সরকার অ্যান্ড সন্স সংস্করণ ;পৃষ্টা-২৮৬

১০. উপন্যাস-পথের দাবী-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,অধ্যায়-২৮,শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ:এম. সি .সরকার অ্যান্ড সন্স

সংস্করণ ;পৃষ্ঠা-২৬৫

১১. প্রবন্ধ- 'শিক্ষার হেরফের, গ্রন্থ-শিক্ষা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,বিশ্বভারতী প্রকাশনী:বৈশাখ,১৩৯৫ ;পৃ.১০

১২. মুক্তির সংগ্রামে ভারত-চিন্মোহন সেহানবীশ,গণেশ ঘোষ,নিশীথ রঞ্জন রায়, অমলেশ ত্রিপাঠি প্রমুখ রচিত, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ:পশ্চিমবঙ্গ সরকার ;দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ,১৯৮৯

১৩. অন্তর-ন্যাশানাল-সঙ্গীত,কাব্যগ্রন্থ ফণি-মনসা,সংকলন গ্রন্থ-সঞ্চিতা-নজরুল ইসলাম,ডি. এম. লাইব্রেরী দ্বাত্রিংশ সংস্করণ,১৩৯০

১৩. প্রবন্ধ- 'শিক্ষা সংস্কার',গ্রন্থ-শিক্ষা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,রবীন্দ্র রচনাবলী,ষষ্ঠখন্ড,বিশ্বভারতী প্রকাশনী :বৈশাখ,১৩৯৫ ;পৃ.৫৭৩